চারণকবি মুকুন্দদাস

গৌরী মিত্র

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

ইতিহাস অতীতের সাক্ষী। অতীতের কথা যদি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে লেখা হয় ইতিহাসে তবে তা যুগের মানুষের মনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। মানুষ তো ইতিহাসের উপাদান থেকে জীবনের শিক্ষা অনেকটাই লাভ করেন।

একথাও ঠিক যে—মানুষেরই ঔদাসীন্যের কারণে ইতিহাসের পাতায় যথাযথভাবে লেখা হয় না উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার কথা। আবার ইতিহাসে লেখা কিছু ঘটনার কথা, কিছু ব্যক্তি-মানুষের কথা মানুষ ভুলে যেতে থাকেন—ইতিহাস-চর্চার অভাবে। এমনটাই ঘটেছে এই জীবনীগ্রন্থের নায়ক মুকুন্দদাসের ক্ষেত্রে।

ভারত তথা বাঙলার বিপ্লবী সন্তান চারণকবি মুকুন্দদাসকে মানুষ ভুলে যেতে বসেছেন। কিছু মানুষ অবশ্য জানেন তাঁকে 'চারণকবি' হিসেবে। চারণকবির ভূমিকায় তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কতটা এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন; এগিয়ে দেওয়ার কাজে তাঁর আত্ম-নিবেদিত প্রয়াস কেমন ছিল—এ সব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা অনেকের নেই। এমন মানুষও আছেন—যাঁরা

জানেন না মুকুন্দদাসের পিতৃদত্ত নাম কি ছিল। জানেন না জীবনের কোন্ পর্যায় থেকে কেমন করে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায়।

মুকুন্দদাসের বৈপ্লবিক কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রজন্মের মানুষদের জানা প্রয়োজন তাঁর অমূল্য সৃষ্টির কথা। সে সৃষ্টির মূলে রয়েছেন শিল্পী-সংস্কৃতিবান তথা সমাজমনস্ক মুকুন্দদাস। কবি-লেখক, গায়ক-অভিনেতা, সুরকার, নাট্যমঞ্চপ্রণেতা-মুকুন্দদাসের ছিল বহুবিধ পরিচিতি।

অবিভক্ত বাংলাদেশের সন্তান 'যজ্ঞেশ্বর দে' তাঁর আদর্শ আর অধ্যবসায়ের জোরেই একদিন হয়ে উঠেছিলেন যুগের চারণসম্রাট। চারণসম্রাট মুকুন্দদাসের আদর্শান্বিত জীবনকথা অবশ্যই প্রেরণামূলক। নতুন প্রজন্মের সব মানুষই এ জীবনকথায় খুঁজে পাবেন শিক্ষার- উপাদান।

দুঃখের কথা—চারণকবি মুকুন্দদাসের জীবনসম্পর্কিত বইপত্রের বড়ো অভাব। পুরোনো দিনে যে সব বইয়ের প্রকাশ ঘটেছিল—সে সব বই দুষ্প্রাপ্য। চারণকবির জীবন সম্পর্কে তাঁর লেখা গান, নাটক ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণাধর্মী বই প্রকাশের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। প্রয়োজন আছে—সাধারণ মানুষের পাঠ-উপযোগী তাঁর জীবনকথা লেখারও—তাঁর লেখা গান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে।

প্রয়োজনের কথা ভেবেই 'গ্রন্থতীর্থ'-র কর্ণধার শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক চারণকবির জীবনকথা লেখার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর ভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর নির্দেশ অনুরোধ মেনে এই জীবনীগ্রন্থ লেখার কাজে ব্রতী হয়েছি। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

গৌরী মিত্র

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম-আন্দোলনের একটি অধ্যায়ে এক বাঙালির অনন্য-অনবদ্য ভূমিকায় সারা দেশের মানুষের মনে জেগে উঠেছিল স্বাধীনতার স্পৃহা। গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষও এ সময়ে জেগে উঠেছিলেন নতুন চেতনায়। তাঁদের মনেও জেগেছিল স্বরাজ-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ। অনন্য ভূমিকায় আসীন এই মানুষটির নাম—মুকুন্দদাস। চারণকবি মুকুন্দদাস।

কবি-গীতিকার, লেখক, সুরকার, অভিনেতা, মানব তথা পল্লীপ্রেমী মুকুন্দদাস ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সরব-প্রতিবাদী হয়ে— হয়েছিলেন রাজদ্রোহী। তাঁর প্রতিবাদের হাতিয়ার কি ছিল? ঢাল-তলোয়ার, বোমা-বন্দুক নয়—শুধু গান সেইসঙ্গে অভিনয়। স্বদেশী যাত্রাপালায় নিজের রচিত অনবদ্য নানা গান গেয়ে তিনি গ্রামীণ—সেই সঙ্গে শহরের মানুষের মনে জাগিয়েছিলেন দেশাত্মবোধ তাঁর রচিত গানের সুরকারও ছিলেন তিনি। মুকুন্দদাসের বলিষ্ঠ-তৎপর ভূমিকাতেই বাংলার জনজীবনে তথাকথিত ভদ্র-শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সাধারণ মানুষদের মেলবন্ধনও ঘটেছিল। এই মেলবন্ধনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ-প্রেক্ষিত হয়ে উঠেছিল সুসংগঠিত সুসংবদ্ধ।

মুকুন্দদাসের পিতৃদত্ত নাম 'যজ্ঞেশ্বর। সবাই তাঁকে বলতেন 'যজ্ঞা'। যজ্ঞেশ্বর তথা যজ্ঞার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠপর্ব বেশি দূর এগোয় নি। শোনা যায়—বরিশাল শহরের কিংবদন্তিসমান দেশবরেণ্য নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলে তিনি টেনেটুনে ক্লাস এইট মানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর পড়াশোনায় ইতি টেনে বাবার মুদি দোকান চালানোর সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে গুণ্ডামিতে মেতে উঠেছিলেন। গুণ্ডাদলের পাণ্ডা যজ্ঞা হয়ে উঠেছিলেন পাড়ার আতঙ্ক। যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞা থেকে চারণকবি মুকুন্দদাসে পরিণত হওয়া—এই উত্তরণপর্ব মনে করিয়ে দেয় পুরাণকথার কাহিনি। যাতে আমরা শুনেছি দস্যু-ডাকাত রত্নাকরের গল্প। সে গল্পে দস্যু রত্নাকর ঘটনার পরিবেশ প্রভাবে একদিন হয়ে উঠেছিলেন মহাত্মা বাল্মিকী। রচনা করেছিলেন অনবদ্য মহাকাব্য রামায়ণ।

যজ্ঞেশ্বর তথা মুকুন্দদাসকে আমরা 'চারণকবি' বলেই জেনে থাকি। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ড ক্রিয়াশীলতার যথাযোগ্য পরিচিতি জানলে জানা যায় তাঁর বহুমুখীন প্রতিভার বিশেষত্ব। কত স্বল্প-সামান্য পুঁজিতে নির্ভর করে তিনি জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই রেখেছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। স্বদেশী-বিপ্লবী, যাত্রাভিনেতা, কবি-গীতিকার- সুরকার...ইত্যাকার পরিচিতির অন্তরালে আছে মুকুন্দদাসের আর এক পরিচয়। সে পরিচিতি বলে—মুকুন্দদাস একজন সিদ্ধসাধক। তাঁর সাধনায় সর্ব ধর্মের মেলবন্ধন ঘটেছে।

একথা ঠিক যে চারণকবির ভূমিকা নেবার যোগ্যতা সব মানুষের থাকে না। এ কথা ঠিক—হিংসার হাতিয়ার দেখে নয়, জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে নয় চারণের কাব্য-গান শুনে সর্ব মানুষের মনে জাগে বিশেষ ভাব-উন্মাদনা। এ যেন উৎসারিত নদীধারা — যা স্বতই সিঞ্চিত করে উর্বর করে তোলে মাটি। তাই তথাকথিত শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান বিপ্লবী-যোদ্ধারা যা পারেন নি

তা পেরেছিলেন চারণকবি মুকুন্দদাস। এ প্রসঙ্গেই এসে যায় বিদ্রোহী কবি নজরুল সাক্ষাতে মুকুন্দদাসকে যে কথা বলেছিলেন সে কথা। তিনি বলেছিলেন—

যাঁরা গান বা বক্তৃতা দ্বারা দেশের জাগরণ আনতে চেষ্টা করেন তাঁরা সকলেই চারণ। আপনি আমি, অথবা আমরা সবাই চারণ, তবে আপনি আমাদের সম্রাট। চারণসম্রাট। বিদ্রোহী কবি নজরুল মুকুন্দদাসকে 'চারণকবি' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

॥ ২ ॥

একটা মানুষের জীবন গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব উদ্যম-প্রচেষ্টায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও দেখা যায়—অনেক মানুষ স্ব-শিক্ষিত হয়ে শুধু জীবনযুদ্ধে জয়ীই হননি, ঐতিহাসিক নানা কর্মকাণ্ড করে দেশের ও দশের মানপ্রাণ রক্ষা করেছেন।

মানুষের জীবন গড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে। পারিপার্শ্বিক তথা কিছু ব্যক্তি-মানুষের সান্নিধ্য-প্রভাব একটা মানুষের জীবনপথকে পৌঁছে দিতে পারে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে। এমনটাই হয়েছিল এই জীবনীগ্রন্থের নায়ক যজ্ঞেশ্বর তথা মুকুন্দদাসের ক্ষেত্রে। কিভাবে, কেমন করে যজ্ঞেশ্বর-যজ্ঞা একদিন স্বনামধন্য চারণকবি মুকুন্দদাস হয়ে উঠেছিলেন—সে এক ঘটনাবহুল ইতিহাস। সব ঘটনার ছিল না আনুকূল্য। ছিল প্রতিকূলতাও। সে সব কথা না জানলে—না শুনলে চারণকবির জীবনমাহাত্ম্য যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠবে না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম-যুদ্ধের ইতিহাস সুদীর্ঘকালীন। প্রাক্-স্বাধীনতা কালে ভারতের অঙ্গরাজ্য বঙ্গদেশ ছিল অবিভক্ত। পূর্ব বঙ্গে অবস্থিত বরিশাল জেলা তথা শহর স্বাধীনতা আন্দোলনকালে সর্বজনপরিচিত হয়ে উঠেছিল কয়েকজন স্বাধীনতা কামী দেশব্রতী ব্যক্তি পুরুষের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সূত্রে। বরিশাল নামক স্থানটিকেই মুকুন্দদাস দিয়েছিলেন জন্মভূমির

মান-মর্যাদা। ভারত তাঁর স্বদেশভূমি আর বরিশাল তাঁর কাছে ছিল স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতৃভূমি সমান। তবে এই বরিশালের মাটিতে মুকুন্দদাসের জন্ম হয় নি। তিনি জন্মেছিলেন পুব বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বানারি গ্রামে—১২৮৫ বঙ্গাব্দে [খ্রিস্টাব্দ ১৮৭৮, ফেব্রুয়ারি ২২] বানারি গ্রামেই ছিল মুকুন্দদাসের পিতৃপুরুষের ভিটে।

মুকুন্দদাসের বাবার নাম গুরুদয়াল দে। মায়ের নাম —শ্যামাসুন্দরী দেবী। মুকুন্দদাসের পিতৃদত্ত নাম—যজ্ঞেশ্বর। ডাক নাম—যজ্ঞা।

যজ্ঞেশ্বর ওরফে যজ্ঞার বাবা গুরুদয়াল ছিলেন খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ। মা শ্যামাসুন্দরী দেবীও ছিলেন অনুরূপ। শ্যামাসুন্দরীর যখন সাতাশ কি আঠাশ বছর বয়স তখন তাঁর সন্তান যজ্ঞেশ্বরের জন্ম হয়। বিয়ের পর দীর্ঘদিন সন্তানাদির জন্ম না দিলে আত্মীয়-পরিজন- প্রতিবেশী তাঁকে বন্ধ্যা বলে শনাক্ত করেছিলেন। তখনকার দিনে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের প্রতি অনেকে অমানবিক মনোভাব পোষণ করতেন। নানা কটূক্তিও করতেন। বন্ধ্যার হাতের ছোঁয়া জল পর্যন্ত খেতেন না। কোনো শুভকাজে বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে অংশ গ্রহণও করতে দিতেন না।

শ্যামাসুন্দরী দেবী সন্তানলাভের ইচ্ছায়-আশায় নানা দেব-দেবীর পুজো করতেন। কাছে দূরের সব দেব-মন্দিরে গিয়ে মানত করতেন। মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিয়ে মানে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ধরণা দিয়ে পড়ে থাকতেন দিনের পর দিন। শোনা যায়—স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি গিয়েছিলেন পাশের গ্রামের এক শিবমন্দিরে। মন্দিরে সন্তান তথা পুত্র কামনা করে পুজো দিয়েছিলেন, আর পেয়েছিলেন এক আশীর্বাদী মালা। দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে—মানত করে প্রায় আঠাশ বছর বয়সে শ্যামাসুন্দরী লাভ করেছিলেন তাঁর সন্তান। সন্তান মানে তাঁর ছেলের নাম রাখা হয়েছিল তাই 'যজ্ঞেশ্বর'।

যজ্ঞেশ্বর মানে মুকুন্দদাস তাঁর বাবা-মা সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন তাতে তাঁর বাবা-মায়ের চরিত্র-ব্যক্তিত্ব যথার্থই ধরা পড়েছে। তিনি তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন—'আমার বাবার নাম গুরুদয়াল দে, মার নাম শ্যামাসুন্দরী। আমার 'পাগল বাবা, পাগলী মা, আমার মার নাম শ্যামা।'

পাগল-পাগলী অর্থে মুকুন্দদাস কি বলতে চেয়েছেন? তাঁর বাবা-মা অত্যন্ত সরল-সাদাসিধে। স্বার্থচিন্তা, বিষয় বুদ্ধির ঊর্ধ্বে।

মুকুন্দদাস তাঁর জন্মস্থান বানারি পাড়া তথা ঢাকা নয়—তিনি বিশেষভাবে আবেগপ্রবণ ছিলেন তাঁর আবাল্যপরিচিত বরিশাল-এর প্রতি। কেন? —এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই আছে কিছু ঘটনাশ্রিত কাহিনি। তা শোনার আগে শুনে নিই মুকুন্দদাসের নিজের ভাষ্যে বরিশাল সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন—'বরিশালের ভূমি আমার নিকট আরাধ্যা; বরিশালের প্রতিটি ধূলিকণা আমার প্রিয়, আমার শিরোভূষণ!'

আসলে বরিশালের আবেষ্টনী তথা পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন — সেখানে পেয়ে ছিলেন বহু মানুষের ভালোবাসা — এ কারণেই মুকুন্দদাসের কাছে বরিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল জন্মভূমি সমান প্রিয় আরাধ্যাভূমি।

॥ ৩ ॥

মুকুন্দদাসের ঠাকুরদা ছিলেন নৌকোর মাঝি। অনেকে বলেন তাঁর ছিল নৌকোর ব্যাবসা। বানারিপাড়া-বিক্রমপুর মানে ঢাকার মাঝিরা ছিলেন হাল-দাঁড় বেয়ে দামাল নদী পেরোনোর কাজে খুব দড়। বরিশাল শহরে নৌকোঘাটায় মুকুন্দদাসের ঠাকুরদা শুধু নন আরও অনেক বিক্রমুপর-বানারিপাড়ার মাঝিদের ছিল আস্তানা। তাঁরাই বরিশালের মানুষকে তরঙ্গা বিক্ষুব্ধ পদ্মা-মেঘনা শীতলাক্ষ্যা নদী পারাপার করিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতেন। ঠাকুরদার ছিল বরিশালের সঙ্গে সবিশেষ যোগ। সেই সূত্রেই